Vol. 44 | No. 2 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমর সেনের কবিতায় নৈঃসঙ্গ্যচেতনা

Volume	44
Issue	2
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	February 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v44i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i2.1
Pages	১-২৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সমর সেনের কবিতায় নৈঃসঙ্গ্যচেতনা

বিশ্বজিৎ ঘোষ*

বিশ শতকের চল্লিশের কাব্যধারায় একটি বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল নাম সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। তিরিশের কাব্যস্রোত চল্লিশে এসে যাঁদের সাধনায় নতুন মাত্রা অর্জন করে, সমর সেন তাঁদের অন্যতম। রোমান্টিকতার বিপরীতে মার্কসিস্ট চেতনার কবি হিশেবে সদর্প ঘোষণা দিয়ে বাংলা কাব্যে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। মার্কসবাদী কবি হিশেবে নিজেকে নির্মাণ করার অক্লান্ত সাধনা সত্ত্বেও কলোনিশাসন, বাবুসংস্কৃতির উত্তরাধিকার, কিম্ভূতকিমাকার নাগরিক জীবন এবং বৈশ্বিক বিপন্নতায় তাঁর কবিতার শরীরে ও সত্তায় লেগেছে নিঃসঙ্গতা নির্বেদ নৈরাশ্য ও অনন্বয়ের অন্তহীন ছাপ। তবে একই সঙ্গে সেখানে আছে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আকুল আকাঙ্ক্ষা। সমর সেনের কবিতায় প্রতিফলিত নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপ-রূপান্তর ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির ব্যাকুল বাসনার ভাষাচিত্র নির্মাণই বর্তমান আলোচনার অন্বিষ্ট বিষয়। তবে সমর সেনের কবিতায় অনুপ্রবেশের পূর্বে নৈঃসঙ্গ্যচেতনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য উপস্থাপনা এখানে আবশ্যক বিবেচনা করি।

২

সমাজসংগঠন এবং ব্যক্তিসংবেদনার আন্তঃসম্পর্কের নিয়ত দ্বৈরথে মানবচৈতন্যে উপ্ত হয় নৈঃসঙ্গ্যের প্রাণবীজ। মানবচিত্তে নৈঃসঙ্গ্যচেতনা সৃষ্টির পশ্চাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আধুনিক মানুষের alienation বা বিচ্ছিন্নতাবোধ। মানুষ সামাজিক জীব—এরিস্টটলের এই প্রত্যয় সর্বাংশে সত্য হলেও, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সামাজিক সংগতিশূন্যতা এবং কালস্রোতের বৈনাশিকতায় ক্রমেই ছিন্ন হয়ে গেছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের অন্বয় ও সংযুক্তির সনাতন বন্ধন। বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রবল রূপ ধারণ করেছে মানুষের এই অনন্বয় বা বিচ্ছিন্নতা। নৈঃসঙ্গ্যচেতনা হচ্ছে এই অনন্বয় বা বিচ্ছিন্নতারই অনিবার্য ফল।

সভ্যতার অভিশাপদীর্ণ ও সমাজের অভ্যন্তর দ্বন্দ্বশাসিত আধুনিক মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-অভিশঙ্কা-চিত্তবৈকল্য এবং বহিশ্চাপ-অন্তশ্চাপ ব্যষ্টিবেদনে সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতাবোধ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানবঅস্তিত্বের মর্মকোষে সংগোপনে সক্রিয় আছে বিচ্ছিন্নতার আদিভ্রূণ। বস্তুত, সভ্যতার ইতিহাস এবং বিচ্ছিন্নতার ধারণা সমান্তরাল ও সমানবয়সী— "The fundamental

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

notion of alienation is at least as old as recorded time."[১] জন্মসূত্রেই মানুষ একা, তার এই একাকিত্ব সমগ্র জীবনের নিত্যসঙ্গী। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার মুহূর্ত থেকেই মা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের জৈব-একাত্মতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—ক্রমেই এই বিচ্ছিন্নতা বহির্জাগতিক অসংগতি এবং চিত্তজাগতিক জটিলতার সঙ্গে বিমণ্ডিত হয়ে মানব-অস্তিত্বকে করে তোলে নিঃসংগতাদীর্ণ ও সংকটসংকুল। ইহুদি ও খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্নতাই হচ্ছে মানুষের এই আদি-বিযুক্তির মৌল কারণ। ঈভের ফল খাওয়ার আদি পাপের কারণে স্বর্গ তথা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দিয়েছেন ক্যাথলিক মনস্তত্ত্ববিদ ও শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দ ; এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেটস', এমন-কি *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* (১৯২২) কাব্যেও এ-মতের সমর্থন পাওয়া যায়। *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ইলিয়াড*, *ওডেসি* প্রভৃতি মহাকাব্যেও আমরা সমাজবিচ্ছিন্ন নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত একাকী মানুষের সাক্ষাৎ পাই।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষের অগ্রযাত্রার অনুগামী হয়েছে একাকিত্ব বা বিচ্ছিন্নতাবোধ। গোষ্ঠীবৃত্তে সংঘবদ্ধ হবার পর মানুষ যতই সমাজের সঙ্গে মেলবন্ধনের চেষ্টা করেছে, ততই সে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির আত্মস্বার্থজনিত কারণে ভিতরে-ভিতরে বিচ্ছিন্নতার বেদনায় হয়েছে পীড়িত। বিচ্ছিন্নতার সংক্রাম ও সভ্যতার ইতিহাস সমান্তরাল গতিতেই হয়েছে বিকশিত ; তাই সমালোচক বলেছেন এই কথা— মানব-সভ্যতার ইতিহাস বস্তুত মানুষের সামূহিক বিচ্ছিন্নতাবোধেরই ইতিকথা—"The history of man could very well be written as a history of the alienation of man."[২]

নৈঃসঙ্গ্যবোধ বা একাকিত্বের অনুভব সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে মানুষকে সংক্রামিত করলেও, আধুনিক কালের বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে রয়েছে মৌলিক ব্যবধান। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বিচ্ছিন্নতার কারণ ব্যক্তি-মনের অতি সংবেদনশীলতা, অধ্যাত্ম-বিশ্বাসজনিত এক ধরনের ঔদাসীন্য এবং বহুমাত্রিক বেদনাজাত শূন্যতাবোধ। কিন্তু আধুনিক কালের বিচ্ছিন্নতা একান্তভাবেই একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অনুষঙ্গ। বস্তুত সমাজের মৌলকাঠামো ও উপরিকাঠামোর মধ্যকার জঙ্গমবিরোধ, বহির্লোক ও অন্তর্লোকের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এবং পরিশ্রম ও প্রাপ্তির অসীম ব্যবধানই আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতার মৌল কারণ।

আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা, বস্তুত, রেনেসাঁস-উত্তর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ও পুঁজিশাসিত সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য এবং মৌলকাঠামো-উপরিকাঠামোর মধ্যকার নিহিত দ্বন্দ্বের ফল। Alienation বা বিচ্ছিন্নতাবোধ একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষা, যার মাধ্যমে আমরা ব্যক্তির পরিচয়, আর্থ-সামাজিক জটিলতাজনিত বহুমাত্রিক বিভ্রান্তি এবং ব্যক্তিবোধের অনুভব আবিষ্কার করি। সমর সেনের কবিতায়ও আমরা আধুনিক মানুষের এই বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার ছায়াপাত লক্ষ করি।

৩

সূচনা-সূত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে, কলোনিশাসন, বাবুসংস্কৃতির উত্তরাধিকার, কিম্ভূতকিমাকার নাগরিক জীবন এবং বৈশ্বিক বিপন্নতা সমর সেনের মানসলোকে উপ্ত করেছে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার বীজ। বিরূপ প্রতিবেশে উপ্ত এই বীজ প্রতিকূল ব্যক্তিজীবনের কারণে হয়েছে দ্রুত-অঙ্কুরিত। সমর সেনের ব্যক্তিজীবনের নানামাত্রিক বিপন্নতায় নৈঃসঙ্গ্যের এই অঙ্কুর দ্রুত ডাল-পালা মেলে ধারণ করেছে মহীরুহ-আকার। ফলে মার্কসীয়চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় স্বতঃই উৎসারিত হয় নৈঃসঙ্গ্যের গরল, অনন্বয়ের অতলান্ত যন্ত্রণা। যৌবনে বিমাতার কারণে তাঁকে হতে হয়েছিল সংসারচ্যুত, সেই সংসারে কখনোই আর ভালোভাবে ফেরা হয়ে ওঠেনি তাঁর। উত্তরকালেও বিরূপ পরিস্থিতি থেকে কখনো মুক্তি পান নি সমর সেন। সমর সেনের ব্যক্তিগত উচ্চারণেই আছে তাঁর এই বিপন্নতার কথা। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করি বিভিন্ন জনের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্রের কিছু অংশ—

ক. ২৩.১২.১৯৪০ তারিখে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা সমর সেনের চিঠির অংশ—

শুনেছি, সহধর্মিনীর কথাটা মনে করলেই লোকের দায়িত্ব জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সে জন্যই আমি বিয়ে করছি না। খালি খাটে শুতে প্রচণ্ড আরাম। কানের কাছে ঝামেলা আমার ভালো লাগেনা, কানদুটো বড়ো কিনা। আমি একদম একলা আছি। পাশের ঘরে একটি অশরীরি [অশরীরী] বৈদ্যকন্যা সঙ্গীতমুখর হয়ে ঘুরে বেড়ান। তাঁর পশ্চাদ্ভাগ মাত্র দেখেছি। চেহারা কেমন জানিনা। ...[৩]

খ. ১৫.০২.১৯৪১ তারিখে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে অর্থনৈতিক দুরবস্থার সংবাদ—

পকেটের অবস্থা এখনো কাহিল। মাসের প্রথম সপ্তাহে ধারটার চুকিয়ে মনের আনন্দে খালি পকেটে বসে থাকি। মুদী ইত্যাদির জন্যই এতো পরিশ্রম করি, এটা ভেবে বেশ বিষণ্ণ লাগে।[৪]

গ. ১৬.০৯.১৯৪১ তারিখে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠিতে কলকাতার প্রতি বিরূপ মানসতার ছবি—

দিল্লীতে কায়েমী হয়ে বসার ইচ্ছে ক্রমশই কমে আসছে। কিন্তু নিরুপায়। কলকাতা আবার একটু superior জায়গা।[৫]

ঘ. ১৪.০২.১৯৪২ তারিখে লেখা দেবীপ্রসাদকে সমর সেন জানাচ্ছেন তাঁর মানসিক বিচ্ছিন্নতার কথা—

এখানে মশাই সময় কাটানো একটা প্রধান সমস্যা। শুনেছি আর্কটিক অঞ্চলে শীতকালে এমন একটা নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতার ভাব আসে যে সেটা শেষ পর্যন্ত মানসিক রোগে পরিণত হয়।[৬]

ঙ. নাগরিক-জীবনে চরম নিঃসঙ্গতার কথা আছে ১৩.০৩.১৯৪৩ তারিখে বুদ্ধদেব বসুর কাছে লেখা চিঠিতে—

এখানকার আর সব খবর একরকম। দিন দিন জীবনযাত্রা একঘেয়ে হচ্ছে, বিকেলে বাড়ী থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না (পত্নীপ্রেমের জন্য নয়), কোথায় যাবো ভেবে পাই না।[৭]

চ. অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং বে-মানান স্বভাবের পরিচয় আছে ১৪.০৪.১৯৪৫ তারিখে বিষ্ণু দে-র কাছে লেখা চিঠিতে—

> কলকাতায় ফেরার জন্য অনেকরকম ফন্দী মনে আসে, কিন্তু কোনোটাই কার্যকরী হচ্ছে না। আপনি ত অনেককে চেনেন। কলকাতায় আমার একটা হিল্লে করাতে পারেন না? রেডিওর চাকরীতে ঢুকে প্রথমে ভেবেছিলাম প্রাণপণে টাকা জমিয়ে তারপর কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা করব। কিন্তু টাকা কাত্‌লা মাছের মত খালি পিছলে বেড়িয়ে যায়, আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।[৮]

—উপর্যুক্ত প্রতিটি উদ্ধৃতিতেই সমর সেনের চিত্তজাগতিক নৈঃসঙ্গ্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের বৈনাশিক প্রতিবেশ ও মধ্যবিত্তের সামূহিক ধস, অন্যদিকে ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতা সমর সেনের কবিপ্রতিভায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় ভরকেন্দ্রে এই অনন্বয়চেতনা অন্যতম অনুষঙ্গ হিশেবে প্রতিভাসিত হয়েছে।

৪

পূর্বেই বলা হয়েছে, সমর সেনের কবিতায় নৈঃসঙ্গ্যচেতনার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে। নগরজীবনের প্রতি আধুনিক মানব-চৈতন্যের বে-মানান স্বভাবজাত বিচ্ছিন্নতা, প্রেম বিচ্ছিন্নতা, প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতা, ঈশ্বর বিচ্ছিন্নতা— এইসব বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতাবোধে ক্লান্ত, পীড়িত ও বিষণ্ন সমর সেনের কবিতা। নগরজীবনের প্রেক্ষাপটেই তাঁর কবিতায় নিঃসঙ্গতার ছায়াপাত ঘটেছে। সমর সেনের কবিতার টেক্‌স্ট অনুসরণে এবার উপস্থাপন করা যাক তাঁর নিঃসঙ্গতাবোধের স্বরূপ ও চারিত্র্য।

৪.১

সমর সেনের কবিতার একটি বিশাল অঞ্চল জুড়েই আছে নগরজীবন ও নাগরিক মধ্যবিত্তের বে-মানান স্বভাবজাত বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নৈঃসঙ্গ্যচেতনার কথা। বিবর্ণ মহানগর, অনাত্মীয় মেট্রোপলিটান সিটি তাঁর কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে প্রতিভাসিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কয়েকটি কবিতা*-র 'নাগরিক' শীর্ষক রচনায় চিত্রিত হয়েছে নাগরিক নিঃসঙ্গতাবোধের দুর্মর যন্ত্রণার ছবি। মহানগর সমর সেনের কাছে অনাত্মীয়, এখানে একান্তই বে-মানান মধ্যবিত্ত মানুষ। মেট্রোপলিটান সিটির চারধারেই তিনি লক্ষ করেন অসুস্থ প্রতিবেশ, ফলত তাঁর চেতনায় দেখা যায় নৈঃসঙ্গ্যের সংক্রাম। নিঃসঙ্গতার এই সর্বগ্রাসী যন্ত্রণা উচ্চারিত 'নাগরিক' কবিতায়—

> মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
> আর দিন।
> সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
> দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল. চকিত ঝলক,

হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন। ...
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ[৯]

মহানগর সমর সেনের কাছে অনাত্মীয় এক বিবর্ণ ভুবন—যেখানে বেঁচে থাকার নেই কোন প্রেরণা—নেই বন্ধু কিংবা প্রেমিকা। সবাই এখানে মদ আর নারী আর টাকার পিছনে ছুটছে। মহানগরের এই বিনাশী রূপ সমর সেনের কবিতায় বপন করেছে নৈঃসঙ্গ্যের বীজ। 'স্বর্গ হতে বিদায়' কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে মহানগরের জীবনধারায় ক্লান্ত ও বিষণ্ন সমর সেনের আকুল আর্তনাদ—

হে শহর হে ধূসর শহর !
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর হে ধূসর শহর!
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচ
দশ টাকায়-কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী,
তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে,
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ ওঠে
হে শহর হে ধূসর শহর।

[স্বর্গ হতে বিদায়/ *কয়েকটি কবিতা*]

মহানগরে লক্ষ মানুষের পদচারণা থাকলেও, নাগরিক মানুষেরা পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত। মেট্রোপলিটান সিটির lonely crowd সমর সেনকে নিক্ষেপ করেছে বিচ্ছিন্নতার সর্বগ্রাসী যন্ত্রণাবর্তে। মানুষ এখানে মাংস আর হাড়ের অস্তিত্ব মাত্র—অবলুপ্ত তার মানবিক মূল্যচেতনা। 'হসন্তিকা' কবিতায় আছে সর্বগ্রাসী বিবর্ণ এই মহানগরের ছবি—

নানাভাবে কসরৎ দেখায়, মোটারে মজা লোটে;
এদিকে স্থান নেই, স্থান নেই রব,
ছোট এ ফ্যাক্টরী
ধানক্ষেত জীর্ণপ্রায়
অগণন ধোঁয়ার ফণা, চিমনিতে চিরেছে আকাশ।

তারি আশপাশে ট্রাম বাস বিমর্ষ মানুষের ভিড়ে
কারা যেন পথে-পথে নিঃশব্দ ঘোরে;
অবশ্য কন্দর্পকান্তি নয়,
তবু সাবলীল আত্মীয়তায় শূন্য হৃদয় ভরে,
দুহাতে সাফ করে যত জটিল জঞ্জাল।

[হসন্তিকা/*নানাকথা*]

মহানগরের এই বিরূপ প্রতিবেশ দেখে কবি উচ্চারণ করেছেন—'আমাদের সব আশা আজ আকাশ কুসুম' (শবযাত্রা/*নানাকথা*)। মহানগরের ভিড়ে একসময় সবাই হারিয়ে যায়, ধোঁয়ায় বিবর্ণ হয়ে যায় মানুষের সব আশা, ভালোবাসা পরিণত হয় পণ্যে। এমন অবস্থায় কবি প্রত্যক্ষ করেন বিবমিষার স্রোত, যে-স্রোতে ক্রমশই নিমগ্ন হয়ে যান স্বয়ং কবি—

লোকে লোকারণ্য, কত লোক,
রক্তাক্ত শরীর,
অনেক পঙ্গু আর কবন্ধের ভিড়,
পায়ে-পায়ে অনেক প্রাণহীন দেহ লাগে,
অগণন জনগণ অচিরাৎ মিশে যাবে এ-ভিড়ে
রক্তাক্ত শরীর

[শবযাত্রা/*নানাকথা*]

উদ্ধৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি বাহুল্য; কেননা, একই ধরনের ভাষায় আরো অনেক কবিতায় রূপান্বিত হয়েছে নিরক্ত মহানগরীর সামূহিক বিবর্ণতা বিসংগতি ও বিপন্নতা। মহানগরীর এই বিবর্ণতা, বিসংগতি ও বিপন্নতা সমর সেনের কবিমানসে জন্ম দিয়েছে নিঃসঙ্গতাবোধ। মহানগরজাত এই নিঃসঙ্গতাবোধ সমর সেন পৌনঃপুনিকভাবে তুলে ধরেছেন বারবণিতার চিত্রকল্পে। বারবণিতাই হয়ে ওঠে তাঁর অতল নৈঃসঙ্গ্যের অতুল বেদনার শব্দছবি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সুমিতা চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ—"... বিবর্ণ মহানগর তাঁর কবিতায় প্রতিভাসিত। এ ব্যাপারে তাঁর প্রিয় চিত্রকল্প হলো বারবণিতা। যাদের জীবনে সত্যিকারের কোনো প্রেম নেই, অথচ বেঁচে থাকার ক্লান্তি ঢেকে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকতে যারা বাধ্য হয়, বাঁচবার অন্য উপায় নেই বলে—এই নগরজীবনের সঠিক ইমেজ হিসেবে তাদেরই মনে পড়েছিল কবির।"[১০] যেমন—

ক. রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে
সূর্যের অলস উত্তাপে,
তখন দিন-রাত্রির নিঃশব্দতা
তোমার রক্তে আসে
নীল নদীর মতো।

কত ধূসর চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ,
পিচের পথে
অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ।
[ভোরের কলকাতা/*কয়েকটি কবিতা*]

খ. চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি :
মাঝে-মাঝে ক্লান্তভাবে কী যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি :
আর শহরের রাস্তায় কখনো-বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
[একটি বেকার প্রেমিক/*কয়েকটি কবিতা*]

—উভয় উদ্ধৃতাংশেই বারবণিতা বা গণিকার অনুষঙ্গে রূপলাভ করেছে নগরজীবনের সামূহিক নির্বেদ নৈঃসঙ্গ্য নিরানন্দের ছবি।

৪.২

পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্বচেতনা থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা যতই প্রবল হয়েছে, ততই বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের প্রেম-বিচ্ছিন্নতা। প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক ভালবাসা এ-যুগের অদৃশ্য দৈত্য নিয়েছে হরণ করে। একালে দাম্পত্য-প্রেমে দেখা দিয়েছে দুর্মর সন্দেহ ও গভীর অবিশ্বাস, বাৎসল্য-প্রেম বাণিজ্যিক মূল্যচেতনায় নিপতিত হয়েছে প্রবল চাপের মুখে। প্রেম-বিচ্ছিন্নতার ফলে মানুষের চেতনায় সৃষ্টি হয় নির্বেদ আর নিঃসঙ্গতা। সমর সেনের কবিতায় আমরা প্রেম-বিচ্ছিন্নতাজাত নৈঃসঙ্গ্যচেতনার গভীর ছায়াপাত লক্ষ করি।

আধুনিক নগরজীবনে প্রেম বলতে কিছু নেই ; প্রেম এখানে এলিয়টের ভাষায়—'nothing with nothing' -এর বন্ধন। এ-কালে কলোনিশাসন ও পুঁজিবাদী শোষণের চাপে প্রেম পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক পণ্যে। প্রেম-বিচ্ছিন্নতার ফলে আধুনিক মানুষ পরিণত হয়েছে অনুভূতিশূন্য জড়-মানুষে। সমর সেন প্রেম-বিচ্ছিন্ন এইসব জড়-মানুষের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

'আমি নই পুরুরবা হে উর্বশী'
মোটরে আর বারে
আর রবিবারে ডায়মন্ডহারবারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,

তারপর সামনে শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো।

[স্বর্গ হতে বিদায়/*কয়েকটি কবিতা*]

রেনেসাঁস-উত্তর কালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-অবলম্বী যে-প্রেমের উন্মেষ ঘটেছিল মানব-মানবীর চিত্তলোকে, পুঁজিবাদী বিকাশের যুগে সে-প্রেমে দেখা দেয় গভীর সংকট। অর্থশাসিত আধুনিক যুগে মানুষের জীবন থেকে অপহৃত হয়েছে আবেগ-অনুভূতি, বিপরীতে প্রবল হয়ে উঠেছে শরীরী-প্রেম। ফলে সনাতন প্রেম-বন্ধনে দেখা দিয়েছে প্রবল ধস, বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়েছে প্রেমের বাসর। শরীরী প্রেম গ্রাস করেছে প্রেমচেতনার সনাতন দায়িত্বজ্ঞান, প্রেম হয়ে উঠেছে পণ্যের সমার্থক। সমর সেনের কবিতায় প্রেম-বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতার ছায়াপাত ঘটেছে গভীর গভীরতর অসুখের রূপ নিয়ে—

তবে চলো, তুমি আর আমি,
যতদিন ক্লান্তি না-আসে ততদিন
স্নিগ্ধ বুকের মধ্যরাত্রে বন্দী রাখো।
তুমি ত জান না, আমি জানি—
আমাদের পিরীতি বালুর বাঁধ,
গণিকার প্রেম আমাদের উজ্জ্বল পৃথিবী। ...
ক্লীবের কুণ্ডল কানে, বিজয়ী অর্জুন আজ
পণ্যযুবতী-সংকুল পথে সঙ্গোপনে ঘোরে,
কালের ক্ষুধিত ক্ষত ম্লান মুখে।

[চিত্রাঙ্গদা/*গ্রহণ*]

এইভাবে দেখা যায়, সমর-উত্তর কালে সামূহিক বিপর্যয়ের প্রতিবেশে মানবচৈতন্যে প্রেমের সনাতন বন্ধন যেখানে ছিঁড়ে গেছে, সেখানে সমর সেনও নিজেকে সুস্থির রাখতে পারেন না; তাঁর কবিতায়ও প্রতিভাসিত হয় পণ্যপূজাশাসিত সমাজে প্রেমহীনতার অকহনীয় যন্ত্রণাকথা।

৪.৩

কলোনিশাসন ও পুঁজিবাদী-শোষণ সমর সেনের চিত্তলোকে উপ্ত করেছে বিচ্ছিন্নতার বীজ। কলোনিশাসনজাত বাবুসংস্কৃতি বাংলার মধ্যবিত্তমানসে জন্ম দিয়েছে বিচ্ছিন্নতা ও বিকৃতির গরল। কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তশ্রেণী ও 'বাবু'রা ছিল দেশমূল-বিচ্ছিন্ন আইভরি টাওয়ারের বাসিন্দা। দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে তাদের ছিল না কোন সম্পর্ক। কলোনিশাসনের প্রক্রিয়ায় উপর্যুক্ত মানস-অসংগতির কারণে মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বাবু-সংস্কৃতির ধারক-বাহকরা ক্রমে নিমজ্জিত হয়েছে বিচ্ছিন্নতা-নির্বেদ-নিঃসঙ্গতার সর্বগ্রাসী অন্ধকারে। কলোনিশাসনজাত বিচ্ছিন্নতা ও বিযুক্তির বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে সমর সেনের কবিতায়—সর্বত্রই ধ্বনিত হয়েছে নিঃসঙ্গতার আকুল আর্তি— যেমন—

কলনির দুর্বিপাকে ক্লীবের বিলাপ!
ইতিহাস ক্ষমাহীন, ক্রন্দনে কী লাভ ?
ময়দানের মাটিতে গোধূলির ছাপ
স্তব্ধ চিল, থেমে গেছে চড়ুয়ের নাচ।
অনাত্মীয় ভিড়ে নগরের রাস্তা ভরে
কফির মলিন রং আমার অন্তরে।
কূপের মণ্ডূক আমি, ঘুমে শুনি কালের প্রপাত—

[২২শে জুন ১৯৪৪/ *তিনপুরুষ*]

কলোনিশাসনের মতো পুঁজিবাদী শোষণও সমর সেনের কবিতায় নিয়ে এসেছে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, নির্বেদের ক্লান্তি। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ-শ্রমিক নিজের কাজের সঙ্গে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শ্রমের ফসল থেকে বিচ্ছিন্নতাই ক্রমে মানুষকে অপর মানুষ থেকে এবং তার আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই বিচ্ছিন্নতা তার চেতনায় জন্ম দেয় অসীম নৈঃসঙ্গ্যবোধ। নিজের শ্রম, উৎপাদিত পণ্য, শ্রম-অধিকার—সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ ক্রমে আপন সত্তা থেকে, মানবিক-সামাজিক সম্পর্ক থেকে হয়ে পড়ে বিযুক্ত ও বিচ্যুত। কার্ল মার্কস এ-প্রসঙ্গে বলেছেন— "... estranged labour estranges the species from man."[১১] মানবসত্তা থেকে মানুষের এই বিচ্ছিন্নতাকে মার্কস পুঁজিবাদী সমাজের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা হিশেবে আখ্যায়িত করেছেন। সমর সেনের বহু কবিতায় পুঁজিবাদী সমাজের শোষণচাপে মানবচিত্তে সৃষ্ট নৈঃসঙ্গ্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।[১২] যেমন—

নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা।
ব্যবসায়ী সংসার
বারে বারে পাকা ধানে মই দিল,
চোখ বেঁধে আজ ভবের খেলায় ভাসা!
তবুত চারিধারে অদৃশ্য ধ্বংসের গ্লেসিআর।

নকল দুঃস্বপ্নে আর কতকাল কাটাই,
সামুদ্রিক মাছের তেলে শরীর বৃদ্ধি ;
শীতের কুয়াশায়, নদীর নরম হাওয়ায়
নিজেরি গোলোকধাঁধায় মন অবিরত ঘোরে ;

[বকধার্মিক/*গ্রহণ*]

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইন ভেঙে দেয় বাংলার সনাতন সামাজিক-গঠন এবং বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় নতুন সমাজশৃঙ্খলা ও শ্রেণীবিন্যাস। এই নতুন শ্রেণীবিন্যাসের সময়ই বাংলায় উদ্ভূত হয় ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ও অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের শাসন ও শোষণকর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য 'লিয়াজোঁ

অফিসার' হিশেবে সৃষ্টি করেছিল ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। লর্ড মেকলের বক্তব্যে ধরা পড়ে এই সত্য—"We must at present do our best to form a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."[১৩] এই প্রক্রিয়া বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীকে জন্মসূত্রেই স্বদেশ-স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে সুদূরসঞ্চারী ভূমিকা পালন করে। তাদের বিচ্ছিন্নতা ছিল ইতিহাস-নির্ধারিত অমোঘ ট্রাজেডি। সমকালে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায়, শিক্ষিত হওয়ার অর্থই ছিল স্বদেশ-স্বজাতি-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। বিদ্যা ও বিত্তের বিকৃত বিকাশ নব-উদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেতনায় কেবল পরিবার, সমাজ আর ঐতিহ্যবিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করে নি, তা জন্ম দিয়েছিল গভীর মানসিক বিচ্ছিন্নতাও। ঔপনিবেশিক শাসনসৃষ্ট মধ্যবিত্তমানসের এই সামূহিক বিচ্ছিন্নতার ছবি সমর সেনের একাধিক কবিতায় শিল্পরূপ লাভ করেছে। যেমন 'পঞ্চম বাহিনী' কবিতায়—

আমরা বাঙ্গালি: মীরজাফরী অতীত, মেকলের শিক্ষাপ্রাপ্ত
বিষবৃক্ষের ফল। ...
মীরজাফরী বদরক্ত আবার অন্তঃশীলা
পাতি কেরানির ঘরে, আনাচে-কানাচে অনেক সংসারে
বেনিয়ার গদিতে, অহিংসার পরম আস্তানায়।
আমাদের বাগানে বাড়ে ফণিমনসার ঝাড়
সঙ্গোপনে আয়োজন চলে মনসার পূজার।

বিষণ্ন ফিরি, কানে কানামাছির গান।

[পঞ্চম বাহিনী/*নানাকথা*]

৪.৪

নিঃসঙ্গ বিযুক্ত মানুষের কাছে সময় এক দুর্ভর যন্ত্রণা। জীবনানন্দের অভাবে একাকী মানুষের কাছে সময় স্তব্ধ হয়ে যায়, ঘড়ির কাঁটা কিংবা পৃথিবীর গতি বন্দি হয়ে পড়ে চার দেয়ালের মধ্যে। কখনো-বা কোন কোন মানুষের কাছে প্রতিদিনই একই সময় পৌনঃপুনিকভাবে একঘেয়েমি হয়ে দেখা দেয়; ফলে সময় তার কাছে কোন প্রেরণা সঞ্চার করে না। সমর সেনের কবিতায় নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনে সময়ের এই নিরানন্দ উপস্থিতি লক্ষ করি। 'মুক্তি' কবিতায় শিল্পিত হয়েছে সময়ের এই ক্লান্তিকর স্তব্ধতা—

... সাইকেলে-ফেরা কেরানির ক্লান্তিতে,
দিনের পর দিন
ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি মরে

মৃত্যু-মুখর রক্তের কান্নায়;
ডাস্টবিনের সামনে
মরে-যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়
সময় এখানে কাটে;

[মুক্তি/*কয়েকটি কবিতা*]

গতিহীন স্তব্ধ এই সময়ের বিরূপতায় প্রেমিকের কাছে প্রেমিকাও কোন আবেগ সঞ্চার করতে পারে না; কখনো-বা সময়ের প্রবল গতিতে হারিয়ে যায় মানুষের প্রেম, তার আবেগ। সময়ের হাতে বন্দি অসহায় এই মানুষের কথাই রূপান্বিত হয়েছে সমর সেনের 'আমন্ত্রণ' কবিতায়। সময়ের অন্ধ গতিতে বন্দি সমরমানসের অসহায় আর্তি, অকহনীয় বেদনা শিল্পিত হয়েছে কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে—

কিন্তু কী হবে তোমার কাছে এসে !
সময় কাটে,
সময় কাটে ট্রামের অবিরাম মুখর শব্দে,
অধ্যাপকদের আর্তনাদে,
আর সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার আমন্ত্রণে সময় কাটে,
সময়ের তীক্ষ্ণ তীর উদ্দাম আমাদের দিকে,
কী হবে, কী হবে তোমার কাছে আসার দুর্লভ সুযোগে—
অন্ধকারের ভারে আকাশ যখন নিঃশব্দ ?

[আমন্ত্রণ/*কয়েকটি কবিতা*]

৪.৫

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্বয় ও সংযুক্তি আন্তঃমানবিক সম্পর্কের মতোই সত্য। সংবেদনশীল শিল্পিচৈতন্য নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে গভীর বন্ধনে থাকে যুক্ত, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গড়ে ওঠে আত্মিক সম্পর্ক। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবোত্তর কালে, মহানগর প্রতিষ্ঠার যুগে, যন্ত্রসভ্যতার কালো ধোঁয়ায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্কে ক্রমেই নেমে আসে মলিনতা। মেট্রোপলিটান মনের যান্ত্রিকতায়, কারখানা আর অটোমোবাইলের চাকায় বন্দি আধুনিক মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে ক্রমে দূরে চলে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই বিচ্ছিন্নতা মানবচিত্তে সৃষ্টি করল নিঃসঙ্গতার অনুভব। রোমান্টিক-আন্দোলনের অন্তিম পর্যায়ে ইংরেজ কবিদের মধ্যে যে প্রকৃতি-বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত, কালে, মহাযুদ্ধের বৈনাশিকতায় সে-বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। বিচ্ছিন্নতা-অনুভবে নিমগ্ন শিল্পীর কাছে মরে গেছে প্রাণময় প্রকৃতি, শুকিয়ে গেছে বসুন্ধরার পীযূষধারা—প্রকৃতি এখন বিচ্ছিন্নতাপীড়িত শিল্পিচৈতন্যে কেবল সৃষ্টি করে অনিঃশেষ নিঃসঙ্গতা। এ-যুগে বিচ্ছিন্ন-বিযুক্ত শিল্পীর কাছে আকাশ খণ্ডিত, মাটি অবলুপ্ত, বৃক্ষলতা প্রাণহীন।[১৪] সমর সেনের কবিতায়ও আমরা প্রকৃতি-

বিচ্ছিন্নতাজাত গভীর নিঃসঙ্গতার ছায়াপাত লক্ষ করি। তাঁর কাছে প্রকৃতি মাধুরী হারিয়ে পরিণত হয়েছে ধোঁয়াক্লিষ্ট জীবন্ত বীজাণুর আধারে—

জানলার ফাঁক দিয়ে দেখি—
পীড়িত আকাশের আভাস:
সে-আকাশে ঘন মেঘ জমে আছে
শীতের অজগরের মতো।

উঠে বাইরে এলাম :
আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ,
আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা
জীবন্ত বীজাণুর মতো।

[ঝড়/*কয়েকটি কবিতা*]

এ-কালের কবির কাছে প্রকৃতি শোনায় না আশা ও আশ্বাসের কথকতা; বরং প্রকৃতি কবির চেতনার স্পর্শে একাকিত্বের বিষণ্নতায় ম্লান ও বিবর্ণ ও রিক্ত। বর্তমান কালে বেজে ওঠে একাকিত্বের স্বরগ্রাম—কবির চেতনালোকের নিঃসঙ্গতা আর প্রকৃতির বিপন্নতা মিলে সৃষ্টি হয় বিষণ্ন এক ঐকতান—

ক. হেমন্তের সোনলি আলো সবুজ ঘাসে।
তারপরে,
ফাঁকা মাঠের নিঃশব্দ, গভীর রাত্রি,
আর নীড়াহারা পাখির শব্দ নিঃসঙ্গ আকাশে।

[আর একটি রাত্রি/*কয়েকটি কবিতা*]

খ. বসন্ত-পীড়িত বন থেকে আজ
মদির গন্ধ আসে,
শুধু মনে পড়ে
নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরে
সুদূর আকাশে চিলের ডাক।

[বসন্তের গান/*কয়েকটি কবিতা*]

কবির কাছে প্রকৃতি রং-রেখা-সবুজতা হারানো জড় সত্তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এ-কারণেই প্রকৃতির শুশ্রূষা তাঁর কাছে বিগত দিনের স্মৃতি মাত্র; কখনো-বা প্রকৃতি পরিণত হয় স্তব্ধ প্রেত-এ—

কর্কশ রঙে ভরে গেল বিকেলের পৃথিবী,
অনেক কাক উৎকণ্ঠিত ফিরে এল;
আসন্ন হেমন্তে

মৃত্যু সহসা ঝুঁকে পড়ে চারিধারে;
নিঃসঙ্গ বট
যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধ প্রেত।

[পলাতক/*গ্রহণ*]

কবির অন্তর্গত নৈঃসঙ্গ্যবোধ প্রকৃতিলোকে সঞ্চারিত, কবি নিজেকে ছাড়িয়ে দেন প্রকৃতির উপাদানপুঞ্জে; এভাবেই ঘটে তাঁর নিঃসঙ্গতা নিরানন্দের বিস্তারণ। প্রকৃতির মধ্যে নিঃসঙ্গতা-যন্ত্রণা সঞ্চারিত করে কবি কি হতে চান নির্ভার? না কি অসুস্থ পীড়িত সময়ের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন তাঁর প্রতিশোধ বাসনা ? বারবার, পৌনঃপুনিকভাবে, সমর সেনের কবিতায় ধ্বনিত হয় রুগ্ন নিঃসঙ্গ প্রকৃতির চূর্ণ ছবি, বিভঙ্গ চিত্রলতা—

মরা ইঁদুরে, ভাঙা বাসনে পথ ভরা,
অদৃশ্যে, হোমের সময় শোনা
অসংখ্য অশুভ পদধ্বনি, দলে দলে
ঘর ছেড়ে নাগরিক যত যাত্রী সমুদ্রতীরে;
পরিহাসে, কলরবে বিলোল নরনারীর
সুরায় সংগীতে ব্যভিচারে কাটে অন্তিম সময়;
ক্লীবের সংখ্যা বাড়ে, করাল চক্র প্রত্যাগত শূন্যে,
একা কাক অধোমুখ, জাগে জীর্ণ গাছের উপরে।

[সারণের গান/*নানাকথা*]

সমর-মানসের নিঃসঙ্গতার স্পর্শ লেগেছে গ্রাম ও শহর—উভয় অঞ্চলের প্রকৃতিলোকে। কালিক বিপন্নতা আর মহাযুদ্ধজাত বৈশ্বিক বিপর্যয়ে গোটা নিসর্গলোক রিক্ত-আশ—এখানে নেই কোন আশ্বাস—হারিয়ে গেছে প্রকৃতির বিশল্যকরণী সত্তা। তাই কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এই হতাশার সুর, নির্গত হয় এই বিবমিষা—

গোধূলির পরে
পুরনো গ্রামের পরিচিত দোকানে আসি,
টিমটিমে আলো, দেয়ালে দেয়ালে করুণ ছায়া,
শূন্য চালের থলি, শীর্ণ ইঁদুর! ...
হাওয়া দেয় ঝলকে ঝলকে,
আকাশে আষাঢ়,
পঙ্গপাল রোগ পুঞ্জীভূত মেঠো পথে,
মাঝে-মাঝে মহাশূন্য ডানা ঝাড়ে শকুনের মতো
মধ্যরাত্রে যখন তীব্র বাঁশি বাজে।

মনে পড়ে, কাছের শহরে অগণন লোক,
চালের কাঙাল!
আজ তাম্রসীতা উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ
কিম্ভূতকিমাকার জীবে আচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতায়
অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে বসে।

[জাতীয় সংকট/*খোলাচিঠি*]

৪.৬

কঠিন বাস্তবের আঘাতের পাশাপাশি সমর সেনের কবিতায় কখনো কখনো রোমান্টিক নৈঃসঙ্গ্যচেতনারও প্রকাশ ঘটেছে। তারুণ্যের রোমান্টিক উন্মাদনায় কোন কোন কবিতার শরীরে লেগেছে একাকিত্বের বেদনাবিলাস-স্পর্শ। যেমন—

ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি
নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কীসের হাহাকার।

[একটি রাত্রের সুর/*কয়েকটি কবিতা*]

রোমান্টিক নৈঃসঙ্গ্যচেতনার আবর্তে পড়ে কবি চিনতে পারছেন না তাঁর প্রকৃত সত্তা। তাই ভিন্ন ভিন্ন সময় তিনি নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখতে পান। সত্তার এই রূপান্তরশীলতা নিঃসঙ্গতাবোধের অনিবার্য ফল। এই চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছে 'পরিস্থিতি' কবিতায়—

এ অবস্থায় বৃন্দাবনী বাঁশি যদি চকিতে শুনি,
তাহলে বলবে লোকে : রোমান্টিক ভূঁইফোড় ;
অত্যধিক পরিশ্রমে হা-হুতাশ চাপি,
কেননা ব্যক্তিগত গান গাওয়া কর্তব্য নয় ;
যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে-মনে প্রেমিক,
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।

[পরিস্থিতি/*নানাকথা*]

৪.৭

পৃথিবীর অধিকাংশ দার্শনিক মনে করেন, যেমন মনে করেন রবীন্দ্রনাথ, মানবসত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত হয়ে আছে বিশ্বসত্তা। বিশ্বসত্তারই এক অতি ক্ষুদ্র অণু-অংশ মাত্র মানবসত্তার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে সমাজের সার্বিক অবক্ষয় ও মহাযুদ্ধের বৈনাশিকতায় মানুষ ক্রমেই ব্যক্তিসত্তা সমাজসত্তা বিশ্বসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, মানুষের অস্তিত্ব ডুবতে থাকে বিপন্নতার অতলে। মানুষের এই চরম অস্তিত্বহীনতার পটভূমিতে বিকাশ লাভ করে কসমস বা বিশ্ব-নিখিলের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ধারণা। মানব-অস্তিত্বের সকল সংগতি ও অর্থ যখন হারিয়ে যায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সকল সম্পর্ক যখন ছিন্ন হয়, তখন সে মানবপ্রজাতি, তার প্রিয়-পৃথিবী, তথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে খুঁজে পায়না কোন সম্পর্ক—সৃষ্টি হয় মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতা। মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতায় মানুষের জ্যোতির্ময় সত্তা নিমজ্জিত হয় অন্তহীন অন্ধকারে, পরম নৈঃসঙ্গ্যানুভূতিতে পূর্ণ হয় তার মানসলোক। সমর সেনের কবিতায় মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতার ফলে সৃষ্ট নৈঃসঙ্গ্যচেতনার ছায়াপাতও আমরা লক্ষ করি—

> আমার অজ্ঞাতসারে
> পুরাতন প্রগলভ দিনরাত্রি আসা-যাওয়া করে,
> নদীর জোয়ারে, অন্ধকারে তিলে তিলে পৃথিবী মরে,
> বুঝি, পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অবিনশ্বর।
>
> তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
> মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
> করাল শূন্যের বৃত্তে
> নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে :
> লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
> শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।
>
> [রোমন্থন/*নানাকথা*]

৪.৮

পুঁজিবাদী সমাজে অবক্ষয়ের সার্বিক কর্কটরোগে মানুষের পারিবারিক বন্ধন বিনষ্ট হয়েছে, ছিন্ন হয়ে গেছে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কের সনাতন সেতুবন্ধ। অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে ভেঙে পড়েছে একান্নবর্তী পরিবারের নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়, রক্ত-সম্পর্কের অন্তরঙ্গ আপনজন চলে গেছে দূরে, অন্য কোন অচেনা প্রান্তরে। সমস্যাসংকুল পারিবারিক জীবন ব্যক্তির কাছে হয়ে ওঠে দুঃসহ, এবং এ-অবস্থায় সে ভালোবাসে একলা সময় কাটাতে; যে-সমাজ তাকে

শিখিয়েছে 'time is money', সে-সমাজের অধিবাসী হয়েও সে ঘরের কোণে সময় কাটায় অর্থহীন অসংগত ভাবনায়। পরিবারের প্রতি কোন দায়িত্ব সে উপলব্ধি করে না, এমন-কি নিজের প্রতিও। এ-অবস্থায় মানবচিত্তে সৃষ্টি হয় অসীম নৈঃসঙ্গ্য, যার প্রকাশ দেখি সমর সেনের কবিতায়—

শূন্য মাঠে স্তব্ধ দিন।
যতদূর চোখ যায়, লৌহরেখা প্রসারিত
নির্বিকার অদৃষ্ট রেখায়। ...
অবোধ মন, বোঝান ব্যর্থ।
পুত্রকন্যা এখনো আঙুলে গোনা যায়,
বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
জিভে স্বাদ নেই, জানি না
কী পাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়।

[রোমন্থন/*নানাকথা*]

যুদ্ধ-উত্তর সময়খণ্ডে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সনাতন বন্ধনে চিড় ধরেছে। সমাজ ব্যক্তির দায়িত্ব নিতে আজ অক্ষম, প্রত্যাশা পূরণে অসমর্থ, নিরাপত্তাবিধানে ব্যর্থ[১৫]; ব্যক্তিও হারিয়ে ফেলেছে সমাজকে দেওয়ার মতো তার সব সম্পদ-সামর্থ্য। ফলে অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়েছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা। এই বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিচৈতন্যে জন্ম দেয় নিরাশা ও নৈঃসঙ্গ্য। সমর সেনের কবিতায়ও আমরা এরূপ সমাজবিচ্ছিন্ন একাকী মানুষের সাক্ষাৎ পাই, যারা প্রকৃত অর্থেই ছিন্নমূল প্রাণের উৎকেন্দ্রে নিঃসঙ্গ ; man নয়, তাদের অভিধা anti-man হওয়াই সময়-সম্মত—

নিঃসঙ্গ, শেষ মিনারে
সূর্যপূজারীর শবের উপরে যেমন,
শূন্য থেকে আজ
একচক্ষু, ছিন্নপাখা জিজ্ঞাসার পাখি
নামে, শুধু নামে।
পলায়ন ছাড়া বেরোবার পথ জানা নেই,
চক্রব্যূহে ঢোকা কেন প্রয়োজন।
অলস চোখে তার শান্ত সমর্পণ,
কঠিন বুক দুরুদুরু কাঁপে,
অনাগত কার পদধ্বনি!
চাবিতে বন্ধ দুয়ার, অন্ধকারে একেলা থাকি,
রক্তের জোয়ার হৃদয় কাঁপায়,

নশ্বর সমর্পণের দারুণ সাহস ছাড়া
ভীরু মজ্জায় আর কিছু নেই।

[গ্রহণ/*গ্রহণ*]

পরিবার এবং সমাজের মতো ঈশ্বর থেকেও কবি সমর সেন বিযুক্ত। ঈশ্বর তাঁর দায়িত্ব পালন করেনি, তাই ঈশ্বরের প্রতিও করিব কোন দায়িত্ব নেই। ঈশ্বরের প্রতি কবির বিশ্বাসের বন্ধন অতি শিথিল, সে-কারণেই স্রষ্টাকে নিয়ে সমর সেন নির্মাণ করতে পারেন ব্যঙ্গসিক্ত এই পংক্তিমালা—

সন্ধ্যার ভিড়াক্রান্ত মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা
দেবতারো চোখে অনিদ্রা আনে;
পুজোর পচা ফলে-ফুলে পিচ্ছিল পথে
রক্তচক্ষু পুরোহিত হাঁকে
হাঁকে জগদ্দল বৃষভ।

[বকধার্মিক/*গ্রহণ*]

মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে সে তার নিজের কর্মের দ্বারাই সমাজের ঐক্যলোক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ছিন্ন হয়ে গেছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সাযুজ্য বন্ধন, তখন বাধ্য হয়ে সে সমাজের অন্য মানুষ থেকে নিজেকে করে রাখে সংগুপ্ত; সকল সমাজিক বন্ধন ছিন্ন করে নিজেকে গুটিয়ে নেয় আপন চিত্তলোকে। আর এ-ভাবেই তার মানসলোকে উপ্ত হয় সত্তাবিচ্ছিন্নতার বীজ। সমাজ-পরিবার-প্রকৃতি-প্রেম-ঈশ্বর—সামূহিক এই উৎকেন্দ্র থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাই সত্তার সবচেয়ে জটিল সংকট। সত্তাবিচ্ছিন্ন শিকড়হীন সংযোগশূন্য মানুষ যাবতীয় বিশ্বাস-প্রত্যয়-প্রমূল্য হারিয়ে নিপতিত হয় নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকার গুহায়। অনন্বয়ের অমোঘ পরিণতিতে সমাজবিচ্ছিন্ন সত্তাবিযুক্ত মানুষ আত্মচেতনায় উপলব্ধি করে আত্মলুপ্তির যন্ত্রণা। সমর সেনের কবিতায় আমরা লক্ষ করি সত্তাবিচ্ছিন্ন মানুষের সামূহিক একাকিত্বের গরলস্রোত—

শান্তি নেই,
লোকারণ্যে ঐশ্বর্যের সূর্য ছড়ায় ছায়ার দুঃস্বপ্ন।
বৃদ্ধ মহাকাল
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এনেছে জরার যন্ত্রণা,
তাইত গলিত দেহের উপরে গভীর রাত্রে ঘোরে
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুন,
নিষ্ফল দিন কাটে ক্ষয়রুগীর কামার্ত প্রার্থনায় ;
তাই ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই ;

তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।
মাথার উপরে আসন্ন পৃথিবীর
অন্ধকার-বিরহিত সূর্য-সংস্কৃত আকাশ,
তবু সত্য শুধু পতন বন্ধুর পথ,
বন্ধ্যা ভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত।

[একটি বুদ্ধিজীবী/*গ্রহণ*]

—সামূহিক এই বিচ্ছিন্নতার বাতাবরণ কবিকে নিমগ্ন করে নিঃসঙ্গতার অন্ধকার গুহায়, সেখানেই তিনি রচনা করেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আত্মময়তার এক অবিনাশী ভুবন। ওই ভুবনের তিনিই অধিশ্বর—একক ব্রহ্ম; অতএব সূর্যপ্রতিম নিঃসঙ্গ—

কেতকীর গন্ধে দুরন্ত,
এই অন্ধকার আমাকে কী করে ছোঁবে?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

[মুক্তি/কয়েকটি *কবিতা*]

৫

নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত মানুষ কখনো কখনো জাগ্রত হয় মানবিক সম্ভাবনা ও দায়িত্বচেতনায়। নিঃসঙ্গতার সর্বগ্রাসী অন্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত করে মানুষ সংলগ্ন হতে চায় বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে। 'বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একাকী' জেনেও অনৈক্যের মধ্যে একতা ও সংহতি সন্ধান করে মানুষ। লোকপুরাণের সেই ফিনিক্স পাখি যেমন আপন দেহভস্ম থেকে নতুন অবয়ব নিয়ে সপ্রাণ সত্তায় জেগে ওঠে, তেমনি সময় ও সমাজের সঙ্গে নিয়ত দ্বন্দ্বে বিক্ষত-বিচূর্ণ হয়েও আত্মগত অনুভবকে বিশ্বগত ঐকতানে সংলগ্ন করার জন্যে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মানুষ কখনো কখনো নতুন সত্তা নিয়ে লাভ করে নবজন্ম। এ-সূত্রেই এসে যায় নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি বা উত্তরণের অনুষঙ্গ।

বস্তুত, মানবিক অন্তঃসার ও সম্ভাবনা আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই ঘটতে পারে নিঃসঙ্গতার সংক্রাম থেকে ব্যক্তির মুক্তি। সমাজ ও সভ্যতার প্রগতির জন্যই প্রয়োজন নিঃসঙ্গতা-থেকে-মুক্ত স্বাধীন ও অস্তিত্বশীল এক মানবপ্রজাতি। শতাব্দীর অভিশাপে ব্যক্তিমন সংক্রামিত হয়েছে বিচ্ছিন্নতায়—একথা যেমন সত্য, তেমনি মিথ্যে নয় বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি-প্রত্যাশী ব্যক্তি-মানুষের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। সময় ও সমাজ যতই বিক্ষত করুক মানুষের সত্তা, তবু তার বিশ্ববীক্ষায় যেহেতু রয়েছে আত্মগত

অনুভবকে বিশ্বগত ঐক্যে মেলানোর বাসনা, তাই এক সময় মানুষের সেই বিশ্ববীক্ষাই নির্মাণ করে সংলগ্নতার ঐকতান।

বিচ্ছিন্নতার সর্বগ্রাসী সংক্রাম থাকা সত্ত্বেও সমর সেনের কবিতায় আমরা একই সঙ্গে লক্ষ করি বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির আকুল আকাঙ্ক্ষার কথা, নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণা থেকে জেগে ওঠার অনেকান্ত বাসনার কথা। নীরক্ত মানুষের ক্লান্তি আর ছিন্নমূল প্রাণের উৎকেন্দ্রে নিঃসঙ্গ মানুষের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অভিলাষে সমর সেন প্রায়ই অবগাহন করেন প্রকৃতি-অর্ণবে, তুলে আনেন সেখান থেকে প্রবহমানতা আর প্রত্যয় আর প্রত্যাশার অফুরান শক্তি-উৎস। এ-ক্ষেত্রে আকাশসন্ধানী বটবৃক্ষই দারুণ দুর্দিনে তাঁর কাছে হয়ে ওঠে জীবনের একমাত্র প্রতীক[১৬]—

একটি একেলা বট খাপছাড়া ছায়া দেয়,
প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখে নি সবুজ কলপ
কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ, আকাশ সন্ধানে।

[জোয়ার ভাটা/*তিনপুরুষ*]

মার্কসবাদীচেতনা সমর সেনের কবিপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক। পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন। বিপ্লবের মধ্য দিয়েই, তিনি ভেবেছেন, গড়ে উঠবে মিলিত স্বরগ্রাম—এবং এভাবেই দূর হবে পুঁজিবাদী শোষণসৃষ্ট ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা। সমর সেনের কবিতায় এ-সূত্রে আমরা প্রায়ই বিপ্লবের অনুষঙ্গ লক্ষ করি। বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে এলে, তিনি বিশ্বাস করেন, কেটে যাবে নৈঃসঙ্গ্যের নীল যন্ত্রণা, ঘটবে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। এ-সূত্রে বিশেষভাবে অনুধাবনীয় নিম্নোক্ত কবিতাংশদ্বয়—

ক. তবু জানি, কালের গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে

[ঘরে বাইরে/*গ্রহণ*]

খ. জানি, এরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান,
গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ,
তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে;
অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।

[নানাকথা/*নানাকথা*]

—লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত কবিতাংশদ্বয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন কবি সমর সেন। তাঁর মতে, এই স্বপ্নই দূর করতে পারে মানুষের নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও অনন্বয়চেতনা।

নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে মুক্তির শক্তি-উৎস হিশেবে কবি কখনো কখনো বিচরণ করেছেন লোকপুরাণের ধূসর জগতে। লোকপুরাণের সেই ফিনিক্স পাখি যেমন আপন দেহভস্ম থেকে নতুন অবয়ব নিয়ে নবজন্ম লাভ করে কবি প্রত্যাশা করেন সম্মিলিত জনতা সেভাবেই জাগ্রত হবে মুক্তির মিছিলে, নতুন প্রাণ নিয়ে—

গ্রহণ লেগেছে প্রাচীন সূর্যে:
এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব
যে-মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে,
প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে।

[বসন্ত/*নানাকথা*]

অনন্বয়চেতনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় একলা-আমির বন্ধন ছিঁড়ে কবি বেরিয়ে এসেছেন বহু-আমির প্রাঙ্গণে, বিশ্বাস রেখেছেন সম্মিলিত জনস্রোতে, সকল মানুষকে তিনি দেখেছেন সহোদর-সত্তায়—

সত্তার খনিতে তবু আসন্ন ফসলের সোনা জলে ;
সকালে আপন বলে
গভীর কুয়ো থেকে জল তুলে, মজুরানী চলে কলসী কাঁখে।
জানি জানি
আমার রক্তের ছন্দে আজো বাজে জাতির ধমনী, আমাকে ডাকে
অসংখ্য সহোদর যেখানে প্রাণ দেয় লাখে-লাখে
ফসলহীন শকুনের মাঠে।

[পোড়ামাটি/*খোলা চিঠি*]

এভাবেই, কখনো প্রকৃতির আশ্রয়ে, কখনো বিপ্লবের পথে, কখনো লোকপুরাণের অনুষঙ্গে, কখনো-বা সম্মিলিত জনশক্তির উত্তাপে সমর সেন আমাদের পৌঁছে দেন নিঃসঙ্গতামুক্ত আলোকিত এক ভুবনে। তার পরম আকাঙ্ক্ষার সেই বাংলা ভুবনের ছবি এঁকে তিনি আমাদের শোনান আশার অবিনাশী গান—

আশা রাখি একদিন এ-কান্তার পার হয়ে পাব
লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে,
পরিচ্ছন্ন খোশগল্পে মুখরিত ঘনিষ্ঠ নগর
বাংলার লোহিত সকালে সকলের অক্লান্ত সফর।

[২২ শ জুন ১৯৪৪/*তিনপুরুষ*]

৬

বিষয়াংশ এবং ভাবপরিমণ্ডলের মতো সমর সেনের কবিতার শব্দানুষঙ্গ এবং আঙ্গিক প্রসাধনেও লেগেছে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার স্পর্শ। শব্দ ব্যবহার, অলংকার নির্মাণ এবং চিত্রকল্প সৃজনে সমর সেন সংশয় বিষণ্নতা ও নিঃসঙ্গতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন—কবিতার অভ্যন্তর স্বাক্ষর এ-সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। তাঁর কবিতার অবয়ব-সংস্থানে নজর দিলে দেখা যাবে তিনি সচেতনভাবে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা একান্তই নৈঃসঙ্গ্যচেতনার পরিচায়ক। বিবর্ণ, নিঃসঙ্গ, একাকী, শূন্যতা, অন্ধকার, মরুভূমি, হতাশা—এইসব শব্দ পৌনঃপুনিকভাবে তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হয়। বলাবাহুল্য, এই শব্দগুচ্ছ মূলত নৈঃসঙ্গ্যের স্মারক।

কবিতায় রঙের ব্যবহার-বৈচিত্র্যেও প্রস্ফুট সমর সেনের নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত মানসতার স্বাক্ষর। অন্ধকার বর্ণই হয়ে ওঠে সমর সেনের বিপণ্ন বিষণ্ন সত্তার অবভাস, অন্ধকারের বর্ণ সম্পাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর নিঃসঙ্গতাদীর্ণ চিত্তের পরিচয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সমালোচকের বিশ্লেষণ—"বিপন্ন, নিষ্ক্রিয়, অন্ধকার-নিমজ্জিত কবির মনোভুবনে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে বহুবঞ্চনা-পীড়নের স্তব্ধতা, বাসনারক্তিম আকাঙ্ক্ষা-অবদমনের আবহ-অনুষঙ্গ। নৈঃশব্দ্য ও নৈঃসঙ্গ্য—যা তাঁর অস্তিত্বের অবভাস, সেখানে অন্ধকার বর্ণ দ্যোতিত করে শূন্যতা, জীবনকে করে প্রত্যাখ্যান।"[১৭] যেমন—

> স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও ?
> আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার, ...
> কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধরাত্রে
> আমাকে একলা ফেলে ?
> কেন তুমি চেয়ে থাক ভাষাহীন, নিঃশব্দ পাথরের মতো ?
>
> [নিঃশব্দতার ছন্দ/*কয়েকটি কবিতা*]

সমর সেনের কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষা সৃজনেও নৈঃসঙ্গ্যচেতনার সংক্রাম ক্রিয়াশীল। অনন্বয়-প্রভাবিত অলংকারের সহায়তায় সমর সেন প্রকাশ করেছেন তাঁর চিত্তজাগতিক বিপন্নতা, বাবুসংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহনে শতাব্দীবিস্তৃত ক্লান্তি আর আত্মগ্লানির বিবিক্তি। উপমার উপাদানপুঞ্জই প্রকাশ করে দেয় সমরমানসের মৌল চারিত্র্য। প্রসঙ্গত অনুধাবনীয় নিম্নোক্ত উপমাসমূহ—

ক. নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে,
ট্রাম লাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর।

[অলকা/*কয়েকটি কবিতা*]

খ. রাত্রে, চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো।

[অলকা/*কয়েকটি কবিতা*]

গ. সাপের শব্দের মতো ক্ষুধিত সময়ের আকাঙ্ক্ষায়
কত মৃত্যুহীন দুর্ভিক্ষ।

[১৯৩৭/*কয়েকটি কবিতা*]

ঘ. পঙ্গপাল রোগ পুঞ্জীভূত মেঠো পথে,
মাঝে-মাঝে মহাশূন্য ডানা ঝাড়ে শকুনের মতো

[জাতীয় সংকট/*খোলাচিঠি*]

ঙ. আমাদের এ টুকরো প্রেম, কৃষ্ণচূড়া দিন,
এ বাসরঘর,
শ্মশান কুরুক্ষেত্রে শকুনের কোলাহলে
মোলায়েম বাঁশির মতো।

[কয়েকটি মৃত্যু /*নানাকথা*]

—উপর্যুক্ত প্রতিটি উপমায় নিঃসঙ্গতাদীর্ণ সমরমানসের নেতিবাদী মানসতা ও নঞর্থক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম চরটি উপমার নঞর্থক চেতনা পঞ্চম উদ্ধৃতিতে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রেম-বাসরঘর কবির কাছে শ্মশান-কুরুক্ষেত্রে শকুনের কোলাহলের মতো মনে হয়েছে। এ ভাবনা, বলাই বাহুল্য, সমর সেনের নিঃসঙ্গতাতাড়িত ও অনন্বয়দীর্ণ চিত্তলোকেরই পরিচায়ক।

উপমার মতো চিত্রকল্পেও সমর সেনের চিত্তজাগতিক নিঃসঙ্গতাবোধের পরিচয় বিধৃত। তাঁর অধিকাংশ চিত্রকল্পের শরীরে ও সত্তায় লেগেছে অনন্বয়ের স্পর্শ, চিত্রকল্পগুলো হয়ে উঠেছে নিঃসঙ্গতার ব্যাপ্ত মহীরুহ। যেমন—

ক. আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো, সুদূর নিঃসঙ্গ।

[মুক্তি/*কয়েকটি কবিতা*]

খ. চাপা রক্তে ক্লান্ত পশ্চিমের আকাশ,
আর দগ্ধ রজনীগন্ধার
উপরে সন্ধ্যার স্তব্ধ হাসি।

[গোধূলি/*কয়েকটি কবিতা*]

গ. রাত্রে, ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে,
আর দিগন্তে জমে ইস্পাতের মতো
ধূসর আকাশ ;

[একটি প্রেমের কবিতা/*কয়েকটি কবিতা*]

—উদ্ধৃত চিত্রকল্পত্রয়ের শরীরে ও মর্মে উৎকীর্ণ স্রষ্টার বিযুক্তিসম্ভব অনেকান্ত নৈঃসঙ্গ্যের হাহাকার। কখনো কখনো চিত্রকল্পের আধারে কবি প্রকাশ করেছেন নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আকুল আরতি—

একটি গ্রাম কুকুর পড়ন্ত রোদে জল খুঁজে ধোঁকে.
একটি একলা বট খাপছাড়া ছায়া দেয়,
প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখে নি সবুজ কলপ
কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ. আকাশ সন্ধানে।
[জোয়ার ভাটা/*তিনপুরুষ*]

৭

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে পুঁজিবাদের অন্তঃক্ষতের আন্তর্জাতিকতাবাদের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের কবিরা বাংলা কবিতায় যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন, সমর সেন তার অন্যতম ধারক। কালের বৈনাশিকতায় তাঁর কবিতায় নৈঃসঙ্গ্যচেতনার স্পর্শ লাগলেও. তিনি মূলত প্রগত জীবনদৃষ্টির কবি। নিঃসঙ্গতার সর্বগ্রাসী যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আর্তির মধ্যেই তাঁর এই প্রগত চিন্তার পরিচয় বিধৃত। মার্কসীয় দর্শনের প্রতি গভীর বিশ্বাসই কালিক বিপর্যয় থেকে তাঁকে মানবতার মৌল স্রোতে প্রবহমান থাকতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সমর সেন, প্রকৃত অর্থেই, বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রা-সঞ্চারক।

তথ্যনির্দেশ

১. Ephraim H. Mizruchi, 'An Introduction to the Notion of Alienation' in Frank Johnson (ed.), *Alienation : Concept, Term and Meanings* (New York : Seminar Press, 1973), P. III

২. Erich Kahler, *The Tower And The Abyss* (New York : Braziller, 1957), P.43

৩. দ্রষ্টব্য—*অনুষ্টুপ* : সমর সেন বিশেষ সংখ্যা (সম্পাদক : পুলক চন্দ), কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১০২

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

৯. সমর সেন, *কয়েকটি কবিতা* (কলকাতা . অনুষ্টুপ, ১৯৮৯), পৃ. ২৭-২৯। বর্তমান আলোচনায় সমর সেনের কবিতার উদ্ধৃতিসমূহ ১৯৮৯ সালে কলকাতার অনুষ্টুপ থেকে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

১০. সুমিতা চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়* (কলকাতা : প্রজ্ঞা প্রকাশন, ১৯৯২), পৃ. ৮২

১১. Karl Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844* (Moscow : Progress Publlishers, Fifth edition, 1977), P. 73

১২. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, *অনন্বয় ও আধুনিক বাংলা কবিতা* (কলকাতা : বাসন্তী লাইব্রেরী, ১৯৭৬), পৃ. ৬৭

১৩. H. Woodrow, *Macaulay's Minutes on Education in India* (Cacutta : Co.'s Press, 1862), P. 115। উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ* (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ১৯৮৭), পৃ. ৪০

১৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ২৯

১৫. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ—প্রথম খণ্ড* (কলকাতা : আশা প্রকাশনী, ১৯৭৪), পৃ. ২৭০

১৬. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, "কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের 'তিন পুরুষ", *অনুষ্টুপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১৭. বেগম আকতার কামাল, *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১০০